বড় দিনের বিশেষ রচনা :

হাইপেশিয়া : এক বিস্মৃতপ্রায় গনিতজ্ঞ নারীর বেদনাঘন উপাখ্যান

অভিজিৎ রায়

২৫ ডিসেম্বর, ২০০৫

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সভ্যতা সৃষ্টির পেছনে নারীর ভুমিকা একদমই স্বীকার করেননি। তিনি বলেন [১]:

> 'সাহিত্য কলায় বিজ্ঞানে দর্শনে ধর্মে বিধি ব্যবস্থায় মিলিয়ে আমরা যাকে সভ্যতা বলি সে হল পুরুষের সৃষ্টি।'

আবার ভলটেয়ার নারীর মননশীলতা, শক্তিমত্তা আর বুদ্ধিবৃত্তিকে স্বীকার করে নিলেও প্রবলভাবেই অস্বীকার করেন নারীর উদ্ভাবনী শক্তিকে। তিনি দাবী করেন [২]:

> 'ইতিহাসে জ্ঞানবতী নারী খুঁজলেই পাওয়া যাবে, এমনকি পাওয়া যবে নারী-যোদ্ধার অস্তিত্বও, কিন্তু কোথাও নারী উদ্ভাবক পাওয়া যাবে না।'

বলতেই হয় - রবিঠাকুর এবং ভলটেয়ার দুজনই ছিলেন ভ্রান্ত, অন্ততঃ ইতিহাস পর্যালোচনার এই ব্যাপারটিতে। ইতিহাস খুঁজলে নারী উদ্ভাবক তো পাওয়া যায়ই, পাওয়া যায় বিজ্ঞান আর প্রকৌশলবিদ্যায় নিবেদিতপ্রাণ অজস্র মহীয়সী নারীর অস্তিত্ব, যারা আমাদের সভ্যতার বিনির্মানে শুধু সহায়তাই করেননি, নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতির পুরোধা ব্যক্তিত্ব হিসেবে। এমনি এক বিস্মৃত-প্রায় বিদুষী বিজ্ঞানী এবং গনিতজ্ঞ ছিলেন হাইপেশিয়া (Hypatia) - জিওর্দানো ব্রুনোর [৩, ২১] মতই বিজ্ঞানের বেদীমূলে আত্মোৎসর্গীকৃত এক প্রাচীন দার্শনিক।

হাইপেশিয়া জন্মেছিলেন ৩৭০ খ্রীষ্টাব্দে আলেকজান্দ্রিয়াতে। গনিতজ্ঞ হিসেবে তার উত্থান যেমন রোমাঞ্চকর তেমনি মর্মান্তিক তার তিরোধানের ইতিহাস। সম্ভবত: তিনিই ছিলেন গনিতে পর্যাপ্ত অবদান রাখা ইতিহাসের প্রথম নারী গনিতজ্ঞ; মার্গারেট অ্যালিক তাঁর 'Hypatia's Heritage' গ্রন্থে

হাইপেশিয়াকে বর্ননা করেন ‘মাদাম কুরীর পূর্ববর্তী সবচাইতে উল্লেখযোগ্য নারী বিজ্ঞানী’ হিসেবে [৯]। তবে কেবল ‘নারী গনিতজ্ঞের’ বা ‘নারী বিজ্ঞানীর’ লেবাস পরিয়ে তাঁর মূল্যায়ন করা হবে স্রেফ বালখিল্যতার সামিল। সত্যিকথা বলতে কি, ইউক্লিডের পর আলেকজান্দ্রিয়াতে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে এত বড় গনিতজ্ঞের জন্ম হয়নি [৪, ১০, ১১]। ইতিহাসবেত্তাদের মতে, হাইপেশিয়া ছিলেন মুক্তবুদ্ধির চর্চাকারী ইতিহাসের শেষ ‘প্যাগান সায়েন্টিস্ট’। অথচ খ্রীস্টধর্মোন্মাদীদের রোষানলে পুড়ে (আক্ষরিক অর্থেই) এই রূপসী বিদুষীকে পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিতে হয় মাত্র ৪৫ বছর বয়সে, ৪১৫ খ্রীষ্টাব্দে। হাইপেশিয়ার মৃত্যুর পর পশ্চিমা বিশ্বে গনিত, জ্যোতির্বিদ্যা, পদার্থবিজ্ঞান আর বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায় উল্লেখযোগ্য কোন উন্নতি সাধিত হয় নি- দীর্ঘদিন, কম করে হলেও প্রায় ১০০০ বছর [৫]। মূলতঃ হাইপেশিয়ার মৃত্যুই সূচনা করেছিল মানব ইতিহাসের এক ঘোর কৃষ্ণ অধ্যায়ের, যে সময়ে মুক্তবুদ্ধি, জ্ঞানচর্চ্চা, বিজ্ঞান-শিল্প-সাধনা তীব্রভাবে ব্যহত হয়। এ সময় জ্ঞানচর্চার বদলে চর্চা করা হয় ধর্মীয় আস্ফালন, কূপমুন্ডুকতা, অরাজকতা আর বর্বরতার। এ সময়টাতে পৃথিবী এগোয়নি এক বিন্দুও, বরং প্রগতির চাকাকে ঘোরানো হয়েছে উলটো দিকে। এই কলঙ্কময় সময়টিকে ইতিহাসবিদরা আখ্যায়িত করেন একটি বিশেষ নামে - ‘অন্ধকার যুগ’ বা Dark Age।

হাইপেশিয়ার বাবা থিওন নিজেও ছিলেন একজন বড় মাপের গনিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদ এবং আলেকজান্দ্রিয়া মিউজিয়ামের পরিচালক। যে সময়টাতে মেয়েদের আক্ষরিক অর্থেই দেখা হত কেবল পুরুষের সম্পত্তি হিসেবে, কথিত আছে, সে সময়টিতেও থিওন তাঁর মেয়েকে গড়ে তুলতে চেয়েছেন ‘একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসেবে’ [৬]। পূর্ণাঙ্গ মানুষ তো হাইপেশিয়া হয়েছিলেনই, আর সেই সাথে ছিলেন অনিন্দ্য সুন্দরী, আর বিদুষী। এ যেন সত্যিকারের মনি-কাঞ্চন যোগ। তাঁকে বলা হত হত - ‘Le souffle de Platon et le corps d'Aphrodite’ - অর্থাৎ, ‘পরমাসুন্দরী আফ্রোদিতির দেহে প্লেটোর আত্মা’ যেন! স্বভাবতাই সুদর্শনা আর বিদুষী হাইপেশিয়াকে বিয়ে করার জন্য উদগ্রীব ছিলেন অনেকেই, কিন্তু স্বাধীনচেতা হাইপেশিয়া তাদের প্রত্যেকের বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন, আর নিজেকে নিয়োজিত করেন বিজ্ঞানের নিবিড় সাধনায়। বেশ কিছুটা সময় দেশের বাইরেও কাটান তিনি, তারপর দেশে ফিরে এসে গ্রহণ করেন আলেকজান্দ্রিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গনিতজ্ঞের পদ। অচিরেই তিনি নিজেকে পরিণত করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম জনপ্রিয় শিক্ষক হিসেবে। তিনি পড়াতেন গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, দর্শন আর মেকানিক্সের বিভিন্ন জটিল জটিল বিষয়গুলো। দূর দূরান্ত থেকে ছাত্ররা শহরে চলে আসতো তার বক্তৃতা শুনতে, আর আলেকজান্দ্রিয়া গ্রন্থাগারের একটি বিশাল কক্ষে প্রতি সন্ধ্যায় সর্বসাধারণের জন্য হাইপেশিয়া বক্তৃতা দিতেন। পয়সা খরচ করে এ নারীর বক্তৃতা শুনতে হত তখন! সাধারণের জন্য দর্শনী ছিলো একটি মোহর [৪]। তবে সভায় যারা স্বচ্ছল ও স্থায়ী সদস্য, তারা আবার মাসিক বা ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সম্মানী প্রদান করতেন। হাইপেশিয়া তাঁর বক্তৃতায় প্লেটো, অ্যারিস্টটলের দার্শনিক কাজকর্ম নিয়ে প্রচুর কথা বলতেন, তাদের পর্যালোচনা করতেন আর দূর দুরান্ত থেকে আসা লোকজন যেন সম্মোহিত হয়ে তার কথা শুনতো পিন পতন নিস্তব্ধতায় [৮]। তার অনুরাগী ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন খ্যাতনামা খ্রীষ্টান। তার মধ্যে একজন ছিলেন সাইরিনের সিনেসিয়াস (Synesius of Cyrene), যিনি পরবর্তীতে Ptolemasis এর বিশপ হন। হাইপেশিয়াকে হত্যার পর তার সমস্ত কাজ কর্মও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় খ্রীষ্টান মৌলবাদীদের হাতে। ইতিহাসবিদরা হাইপেশিয়ার কাজকর্মের যেটুকু জানতে পেরেছেন তার মধ্যে একটা বড় উৎসই হল এই সিনেসিয়াসের লেখা চিঠিপত্র। সেই চিঠিগুলোতে হাইপেশিয়ার প্রতি ব্যক্ত হয়েছে গভীর শ্রদ্ধা, ভক্তি আর ভালবাসা।

হাইপেশিয়ার মৌলিক কাজের মধ্যে রয়েছে দায়োফ্যান্তাস রচিত অ্যারিথমেটিকা পুস্তকের উপর ১৩ অধ্যায়ের একটি আলোচনা, যার বেশ খানিকটা অংশই পরবর্তীতে দায়োফ্যান্তাইন পান্ডুলিপিতে অন্তর্ভুক্ত

হয় [৬]। এছাড়া তিনি অ্যাপোলোনিয়াসের কৌণিক ছেদ পুস্তিকার উপর একটি আলোচনা লিখেন [৫], আর টলেমীর কাজের উপর আলোচনা লিপিবদ্ধ করেন Astronomical canon শিরোনামে [৪]। তিনি তার বাবাকে জ্যামিতির কালজয়ী গ্রন্থ Euclid's element এর নতুন সংস্করণ তৈরীতেও সহায়তা করেছিলেন - যে সংস্করণটি আজও পাঠ্যপুস্তকে ব্যবহৃত হয় [৫]। হাইপেশিয়া আর তার বাবা যৌথভাবে টলেমীর Almagest এর উপরও কাজ করেন। তবে যে দুটি যন্ত্রের আবিস্কার হাইপেশিয়াকে 'উদ্ভাবক' হিসাবে মহিমান্বিত করেছে তার একটি হল অ্যাস্ট্রোলেব (Astrolabe) - যেটি ব্যবহৃত হত গ্রহ-নক্ষাত্রাদির দৈনন্দিন ঘূর্ণন গণনায়, আর মহাজাগতিক নানা সমস্যা সমাধানে; আর একটি হল হাইড্রোস্কোপ (Hydroscope) যা দিয়ে তরল পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব মাপা যেত [৭]। এছাড়া তিনি পানির লেভেল মাপার জন্য একটি যন্ত্রও তৈরী করেছিলেন।

কিন্তু হাইপশিয়াকে মেরে ফেলা হল কেন? এটি বুঝতে হলে তৎকালীন মিশরীয় শাসনতন্ত্রের বিশেষতঃ টলেমী বংশের দিকে একটু চোখ মেলে তাকানো দরকার। ইতিহাসের বই ঘেটে পাওয়া যায়- টলেমী সোতার আর তার ছেলে টলেমী ফিলাডেফেলস থেকে আরম্ভ করে জনা পনের টলেমীয় বংশদ্ভুত রাজা তখন মিশর শাসন করেছিলো। তার মধ্যে সবচাইতে যিনি পরিচিত তাকে নিয়ে হলিউডে ছবি পর্যন্ত হয়েছে, সর্বশেষ শাসক সেই যে ভুবনমোহিনী ক্লিওপেট্রা। খ্রীষ্টপূর্ব ৩১ সালে ক্লিওপেট্রাকে হত্যা করা হয় আর ক্লিওপেট্রা ও রোম সম্রাট সিজারের ছেলে টলেমী সিজারিয়ান রাজা হন। খ্রীষ্টপূর্ব ৩০ সালে তাঁকে হত্যার মাধ্যমে টলেমী বংশের সমাপ্তি ঘটে এবং মিশর রোম সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশে পরিণত হয়। তখন থেকে শুরু করে হাইপেশিয়ার সময় পর্যন্ত আলেকজান্দ্রিয়া রোমান শাসনের জাঁতাকলে ভয়াবহভাবে নিষ্পিষ্ট এক শহরে পরিণত হয় [৪]। দাসপ্রথার অভিঘাত ধ্রুপদী সভ্যতার প্রাণশক্তিকে একেবারে নিঃশেষিত করে ফেলেছিল। খ্রীষ্টিয় চার্চ তখন প্রাচীন প্যাগান মূল্যবোধ, প্রভাব আর সংস্কৃতিকে উপড়ে ফেলে তার নবোত্থিত শক্তিকে সংহত করার চেষ্টা করছে পুরোমাত্রায়। হাইপেশিয়া দাঁড়িয়েছিলেন এই প্রবল ক্ষমতাসম্পন্ন শক্তিগুলোর ঘুর্ণিকেন্দ্রে - বিদ্যমান সংঘর্ষের এক নির্ণায়ক শক্তি হিসেবে। মার্গারেট এলিক তার *Women and Technology in Ancient Alexandria : Maria and Hypatia* প্রবন্ধে বলেন : 'Hypatia was a scholarly pagan and a woman, an espouser for Greek scientific rationalism and an influential political figure. This proved to be a dangerous combination.'। তার বিচক্ষণতা আর বিচার বুদ্ধি সমাজে এতটাই প্রভাব বিস্তার করেছিলো যে নগরপাল অরিস্টিস (Orestes) হাইপেশিয়ার মতামত না নিয়ে কোন কাজ করতেন না [৮]। এই সমৃদ্ধি আর স্বীকৃতিই বোধ হয় হাইপেশিয়ার কাল হল! 'তুচ্ছ নারী'র মেধা, মনন আর জ্ঞান অনেক সময়ই পরাক্রমশালী পুরুষতন্ত্রের কাছে নিতান্ত অসহনীয়। তার মধ্যে আবার সে নারী যদি হয় বিজ্ঞানমনস্ক মুক্ত-বুদ্ধির চর্চাকারী, রাজনীতি সচেতন এক স্বাধীনচেতা রমণী! আমেরিকান বিজ্ঞানী J.W.Darper স্পষ্ট করেই বলেন, 'হাইপেশিয়া ছিলেন ধর্মের বিপরীতে বিজ্ঞানের নিবিড় সমর্থক।' হাইপেশিয়াকে *দারপার* দেখেছেন সেসময়কার ইউরোপীয় সভ্যতার বিদ্যমান দুটি ধারার সংঘর্ষে এক বিরোচিত নিয়ামক চরিত্র হিসেবে [১২]। দুটি ধারার একটি হচ্ছে মুক্ত বুদ্ধির চর্চা সমৃদ্ধ 'লিবারেল' ধারা আর একটি হল কট্টর-পন্থী ধর্মান্ধ 'পুরিতানিক' ধারা। হাইপেশিয়ার অনেক বক্তব্যই ছিলো গোঁড়ামী বিরোধী আর মুক্তবুদ্ধির প্রতি সমর্থনসূচক, যা নিঃসন্দেহে কট্টরপন্থিদের উষ্মার কারণ ঘটিয়েছিলো। হাইপেশিয়া তাঁর এক শিষ্যকে বাইবেল সম্পর্কে বলেছিলেন [৪] :

> 'আমি খ্রীষ্টান নই। কিন্তু বাইবেলের প্রাচীন ও নবীন দুটো খন্ডই আমি পড়েছি। আব্রাহাম ইয়াকুব ইউসুফ ধর্মই বল, আর যীশু খ্রীষ্টের ধর্মই বল, অহঙ্কার না করেও আমি বলতে পারি, ও দুটি মর্মই আমি উপলব্ধি করেছি। বিশ্বাসের কথা, ঈশ্বরের প্রেমের বাণী ও-দূটিতে আছে ঢের কিন্তু দার্শনিকের দৃষ্টিতে ওসব

বালকসুলভ উচ্ছ্বাস ছাড়া আর কিছু নয়। পরিণত বুদ্ধির জাতির জন্য থাকা উচিৎ যুক্তি-নির্ভর জ্ঞানভিত্তিক ধর্ম একটা, যা ছিলো গ্রীকদের, যার পুনঃপ্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প নিয়ে আমি যথাসাধ্য কাজ করে যাচ্ছি আলেকজান্দ্রিয়ায় বসে।'

এ ধরনের স্বচ্ছ কথাবার্তা যে যুগে যুগে মৌলবাদীদের ক্ষিপ্ত করেছে তা বলাই বাহুল্য। এমনি একজন মৌলবাদী খ্রীষ্টান ছিলেন **সিরিল** (Cyril) যিনি ৪১২ খ্রীষ্টাব্দে আলেকজান্দ্রিয়ার আর্চ বিশপ বা পেট্রিয়ার্ক হয়েছিলেন। এই 'পেট্রিয়ার্ক' ব্যাপারটা হয়ত অনেকের কাছেই অপরিচিত। ছোটট একটু বয়ান করা যাক এ নিয়ে। পোপের পদ সৃষ্টির পূর্বে খ্রীষ্টানদের ধর্মগুরু ছিলেন তিনজন। তাদের একজন থাকতেন রোমে, একজন বাইজেন্টিয়ামে আর আরেকজন থাকতেন আলেকজান্দ্রিয়ায়। তাদেরকে বলা হত পেট্রিয়াক। আলেকজান্দ্রিয়ার এই পেট্রিয়ার্ক সিরিল হাইপেশিয়ার রাজনৈতিক দর্শনের জন্য, তার মুক্তবুদ্ধির চর্চার জন্য এবং সর্বোপরি নগরপাল অরিস্টিসের সাথে হাইপেশিয়ার সুসম্পর্কের কারণে তাঁকে ঘৃণার চোখে দেখতেন। মুলতঃ এই আর্চ বিশপ সিরিল খ্রীষ্ট ধর্মের পথ প্রশস্ত করার জন্যই হাইপেশিয়াকে হত্যার সিদ্ধান্ত নেয় [৪]। এর পেছনে আরো একটি রাজনৈতিক দিকও ছিলো। সিরিলের সাথে অরিস্টিসের ছিলো ক্ষমতার দ্বন্দ্ব। অরিস্টিসের প্রতি হাইপেশিয়ার প্রচ্ছন্ন সমর্থন সিরিলকে প্রতিহিংসাপরায়ণ করে তুলে। খ্রীষ্টিয় অনুরাগীদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হয় যে, আর্চ বিশপের সাথে অরিস্টিসের পুনর্মিলনে হাইপেশিয়াই হচ্ছেন প্রধান অন্তরায় [১৩]।

চার্লস কিংসলের উপন্যাস Hypatia and or the New Foes with an Old face (1853) থেকে জানা যায়, বিশপ সিরিল খ্রীষ্টান ধর্মানুরাগী তরুণদের হাইপেশিয়ার বক্তৃতা শুনতে যেতে নিরুৎসাহিত করতেন। তার ভয় হত যে, হাইপেশিয়ার প্রবল ব্যক্তিত্ব আর তীক্ষ্ণ যুক্তির কাছে খ্রীষ্ট ধর্মের দার্শনিক ভিত্তির দুর্বলতাটুকু প্রকাশিত হয়ে পড়বে। উপন্যাসে দেখা যায়, সিরিলের প্রিয় এক তরুণ খ্রীষ্টান সন্ন্যাসী ফিলামন (Philammon) হাইপেশিয়ার সভায় যাওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করলে সিরিল হাইপশিয়াকে তাঁর সামনে তুলে ধরেন এভাবে : 'হাইপেশিয়া হচ্ছেন সাপের চেয়েও ধূর্ত আর সব ধরনের চালাকিতে ওস্তাদ আর যুক্তিতে পটু।' আর সিরিল ফিলামনকে এই বলে সাবধান করেন যে, 'তুমি যদি ওখানে যাও তবে নিজেকে ঠাট্টার পাত্র বলে মনে হবে, আর লজ্জায় তুমি পালিয়ে আসবে [১৪]।'

ফিলামনের মত সন্ন্যাসীদের প্রাথমিক লক্ষ্য ছিলো হাইপেশিয়ার বক্তৃতামঞ্চের সামনে দাঁড়িয়ে হাইপেশিয়ার সমস্ত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে মিথ্যা প্রমাণিত করা। তারা ভাবতেন তুচ্ছ নারী কী জানবে দর্শনের, বিজ্ঞানের? অথচ তাঁর অনুগামীদের কাছে হাইপেশিয়া ছিলেন মিনার্ভার মত জ্ঞানময়ী, জুনোর মত মর্যাদাময়ী আর আফ্রোদিতির মত সুন্দর। কিংসলের উপন্যাসে দেখা যায়, ফিলামন কিছুটা কৌতুহল আর আর অবজ্ঞা নিয়েই প্রথমে হাইপেশিয়ার বক্তৃতা শুনতে গিয়েছিলেন, মূল উদ্দেশ্যটি ছিল হাইপেশিয়াকে ভুল প্রমাণ করে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করা। কিন্তু হাইপেশিয়ার ব্যক্তিত্ব, বাগ্মীতা আর জ্ঞানের আলোক-স্পর্শে ফিলামন আক্ষরিক অর্থেই সম্মোহিত হয়ে পড়েন এবং শেষ পর্যন্ত হাইপেশিয়ার একজন একান্ত অনুরাগীতে পরিণত হন। তাদের বন্ধুত্ব আর কিছুটা নৈসর্গিক প্রেমের মূর্চ্ছনা হাইপেশিয়ার মৃত্যুর শেষদিনটি পর্যন্ত অক্ষুন্ন ছিল [১২]।

তার প্রিয় খ্রীষ্টান সন্ন্যাসীদের হাইপেশিয়া-মোহ সিরিলকে ক্রুদ্ধ নেকড়ের মতই উন্মত্ত করে তোলে। সিরিল হাইপেশিয়াকে হত্যার সিদ্ধান্ত নিলেন। ৭১ এ বাঙালী বুদ্ধিজীবী হত্যার মতই সিরিল যেমনিভবে বেছে বেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের 'নব্যতান্ত্রিক' নিও-প্লেটোনিস্টদের ধরে ধরে হত্যার মহোৎসবে মত্ত ছিলেন, এমনি এক দিন কর্মস্থলে যাওয়ার পথে হাইপেশিয়া মৌলবাদী আক্রোশের শিকার হলেন, অনেকটা আজকের

দিনের হুমায়ুন আজাদের মতোই। তবে হাইপেশিয়ার ক্ষেত্রে বীভৎসতা ছিলো আরও ব্যাপক। হাইপেশিয়া-হত্যার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ পাওয়া যায় পনের শতকে সক্রেটিস স্কলাসটিকাসের রচনা হতে [১৫]:

> ‘পিটার নামের এক আক্রোশী ব্যক্তি অনেকদিন ধরেই তক্কে তক্কে ছিলো, শেষমেষ সে হাইপেশিয়াকে কোন এক জায়গা হতে ফিরবার পথে কব্জা করে ফেলে। সে তার দলবল নিয়ে হাইপেশিয়াকে তার ঘোড়ার গাড়ী থেকে টেনে হিঁচড়ে কেসারিয়াম (Caesarium) নামের একটি চার্চে নিয়ে যায়। সেখানে তারা হাইপেশিয়ার কাপড়-চোপড় খুলে একেবারে নগ্ন করে ফেলে, তারপর ধারালো অস্ত্রের সাহায্যে তাঁর চামড়া চেঁছে ফেলে, তার শরীরের মাংস চিরে ফেলে, আর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার আগ পর্যন্ত হাইপেশিয়ার উপর তাদের অকথ্য অত্যাচার চলতে থাকে। এখানেই শেষ নয়; মারা যাবার পর হাইপেশিয়ার মৃতদেহ টুকরো টুকরো করে সিনারন (Cinaron) নামের একটি জায়গায় জড় করা হয় আর তারপর পুড়িয়ে তা ছাই করে দেয়া হয়।’

হাইপেশিয়াকে হত্যা করা হয় ৪১৫ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে। হাইপেশিয়ার হত্যাকারীদের তালিকায় ছিলো মূলতঃ সিরিলের জেরুজালেমের চার্চের প্যারাবোলানস, মৌলবাদী সন্ন্যাসী, নিট্রিয়ান খ্রীষ্টীয় ধর্মবাদীরা [৫]। তবে সিরিল নিজ মুখে তার সাংগপাংগদের হাইপাশিয়াকে হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন কিনা তা অবশ্য বিতর্কের উর্ধ্বে নয়। কিন্তু এটি অন্ততঃ নিঃসন্দেহ যে, সিরিল এমন এক ধরনের রাজনৈতিক বাতাবরণ তৈরী করতে সমর্থ হয়েছিলেন যা হাইপেশিয়া-হত্যায় ইন্ধন যুগিয়েছিলো। সিরিলকে পরবর্তীতে ধর্মীয় অধিকার বলে সেইন্ট বা সন্ত হিসেবে অভিসিক্ত করা হয়। ইতিহাসের জঘন্যতম অপরাধের উপযুক্ত ধর্মীয় ‘শাস্তি’ই বটে!

যা হোক, অরিস্টিস এই নিষ্ঠুর হত্যাকান্ড সম্বন্ধে রিপোর্ট করেন এবং রোমকে এর তদন্ত পরিচালনা করতে অনুরোধ করেন। তারপর তিনি তার কর্মস্থল থেকে অব্যহতি নিয়ে আলেকজান্দ্রিয়া থেকে চিরতরে বিদায় নেন। আর ওদিকে তদন্তকাজ পদে পদে ‘পর্যাপ্ত সাক্ষীর অভাবে’ বাধাপ্রাপ্ত হয়, আর শেষপর্যন্ত সিরিল জল ঘোলা করতে এও জনসমক্ষে প্রচার করতে শুরু করেন যে, হাইপেশিয়া নাকি জীবিত আছেন এবং এথেন্সে বহাল তবিয়তে বাস করছেন [১৬]।

হাইপেশিয়ার হত্যাকান্ড আলেকজান্দ্রিয়া এবং পুরো রোমান সাম্রাজ্যে বৈজ্ঞানিক আর যুক্তিবাদী শিক্ষার বিদায় ঘন্টা বাজিয়ে দেয়। ইউরোপ পুরোপুরি প্রবেশ করে ‘অন্ধকার যুগে’। এমনকি মৃত্যুর পরও হাইপেশিয়াকে রেহাই দেয়নি ধর্মান্ধ মৌলবাদীরা। ৫৮১ খ্রীষ্টাব্দে চার্চের পক্ষ থেকে হাইপেসিয়াকে উদ্দেশ্য করে ঘোষণা করা হয় ‘That woman had neither souls nor reasons’ [৫]। গোঁড়া খ্রীষ্টধর্মের প্রসারের সাথে সাথে আলেকজান্দ্রিয়া নানা ধরনের ধর্মীয় সংস্থার (cult) ক্রীড়নকে পরিণত হয়ে যায়, মুক্তবুদ্ধির চর্চা ব্যহত হয়; নানা ধরণের ধর্মীয় তুক-তাক, জ্যোতিষশাস্ত্রের চর্চা, কুসংস্কার, অতীন্দ্রিয়তা আর আধ্যাত্মিকতা ধীরে ধীরে বৈজ্ঞানিক গবেষণার স্থান দখল করে নেয়। ৬৪০ খ্রীষ্টাব্দে আলেকজান্দ্রিয়া আরবদের অধীনস্ত হয় আর সমস্ত গ্রন্থাগারটি পুনর্বার (জুলিয়াস সিজারের আগ্রাসনের পর) ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় - এবারে অবশ্য বর্বর খ্রীষ্টিয় মৌলবাদীদের আরেক সহোদর ইসলামী মৌলবাদীদের হাতে [৫]। কথিত আছে আলেকজান্দ্রিয়া গ্রন্থাগারের বই-পত্তর ধ্বংস করতে গিয়ে খলিফা ওমর নাকি বলেছিলেন -

> ‘বইপত্রগুলো যদি কোরানের শিক্ষার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ না হয় তবে সেগুলো আমাদের দৃষ্টিতে নিতান্তই অপ্রয়োজনীয়। কাজেই ওগুলোর ধ্বংস অনিবার্য; আর বই-পত্তরগুলোতে যদি কোরানের শিক্ষার সাথে

> সঙ্গতিপূর্ণ কোন কথাবার্তা আদৌ থেকেও থাকে তবে সেগুলো হবে প্রয়োজনের অতিরিক্ত। কাজেই সে দিক দিয়েও ওগুলো ধ্বংস করা জায়েজ।’

অবশ্য অনেক গবেষক আলেকজান্দ্রিয়া গ্রন্থাগারের উপর ইসলামের আগ্রাসনকে কেবল ‘মিথ’ বলেই মনে করেন [১৭]।

হাইপেশিয়াকে হত্যার পর তাকে যেন আক্ষরিক অর্থে ভুলেই গিয়েছিলো মর্তের বিস্মৃতিপরায়ন মানবজাতি। স্মৃতির পরতে পরতে পড়েছিলো ধুলোর পুরু স্তর। ৪১৫ খ্রীস্টাব্দে তাকে হত্যার পর প্রায় তের’শ বছর ধরে সত্যিকার অর্থেই যেন নিশ্চুপ হয়ে পড়ে রয়েছিলো সবাই। অনেক অনেক বছর পরে - সেই ১৭২০ সালে জন টোলান্ড (John Toland) "Hypatia or the History of a most beautiful, most virtuous, most learned and in every way accomplished lady; who was torn to pieces by the clergy of Alexandria to gratify the pride, emulation and cruelty of the archbishop commonly but undeservedly titled St Cyril" নামের দীর্ঘ শিরোনাম বিশিষ্ট প্রবন্ধে হাইপেশিয়াকে স্মৃতির ছাইভস্ম হাতড়ে আমাদের সামনে তুলে আনেন। তিনিই বিশ্ববিবেক কে প্রশ্নবিদ্ধ করে তোলেন এই বলে যে হাইপেশিয়ার মত অনিন্দ্যসুন্দর, বিজ্ঞ এবং নিষ্পাপ দার্শনিকের রক্তে হাত রঞ্জিত করার দায়ে সমস্ত পুরুষতন্ত্রের লজ্জিত হওয়া উচিৎ [১২]। হাইপেশিয়ার হত্যাকারী হিসেবে খ্রীষ্টিয় চার্চ আর তার তৎকালীন পুরোধা সিরিলকে অভিযুক্ত করে টোলান্ড ওই প্রবন্ধে স্পস্ট করেই বলেন :

> ‘সেইন্ট বা সন্ত নামধারী পুরুষতন্ত্রে দীক্ষিত এক বিশপ ছিলেন এই জঘন্য হত্যাকান্ডের মূল হোতা, আর তার শিষ্যরা ছিলেন তাদের গুরুর জিঘাংসা চরিতার্থ করার নিয়ামক।’

টোলেন্ডের হাত ধরে পৃথিবী যেন কুম্ভকর্ণের ঘুম থেকে জেগে উঠলো। যে ভলটেয়ার তন্ন তন্ন করে খুঁজেও ইতিহাসে এর আগে কোন ‘নারী উদ্ভাবক’ পাননি, তিনিই হলেন এবার হাইপেশিয়া বন্দনায় উচ্ছ্সিত। তিনি Examen Important De Milord Bolingbroke Ou Le Tombeau Du Fanatisme (1736), বইয়ে বলেন :

> “এই পাশবিক হত্যাকান্ড পরিচালিত হয় সিরিলের মাথা-মুড়োনো ভিক্ষু হিসেবে খ্যাত কতকগুলো ‘ডালকুত্তা’র সহচর্যে, আর উগ্র, গোঁড়া ধর্মবাদীদের আস্ফালনে”।

ভলটেয়ার হাইপেশিয়ার অবদান উল্লেখ করেছিলেন তাঁর Dictionnaire Philosophique বইয়েও। তিনি সেখানে হাইপেশিয়াকে একজন সম্মানিত শিক্ষক এবং বিজ্ঞানী হিসেবে উল্লেখ করেন আর সিরিলকে হত্যার আভিযোগে সরাসরি অভিযুক্ত করে বলেন, ‘সিরিল তাঁর খ্রীষ্টিয় আক্রোশ হাইপেশিয়ার উপর ঝেরে দিলেন।’। পরবর্তীতে হাইপেশিয়াকে নিয়ে এন্তার লিখেছেন এডওয়ার্ড গিবন (দ্য ডিক্লায়েন এন্ড ফল অব রোমান এম্পায়ার), দামাস্কিউয়াস (সুদা), হেনরি ফিল্ডিং (আ জার্নি ফ্রম দিস ওয়ার্ল্ড টু দ্য নেক্সট), চার্লস লিকন্ট দ্য লিসল (Hypatie; Hypatie et Cyrille), মরিস বারস্ (Sous l'oeil des barbares), চার্লস কিংসলে (হাইপেশিয়া অর দ্য নিউ ফো’স উইথ এন ওল্ড ফেস্), জে ডবলিউ দারপার (হিস্ট্রি অব ইন্টেলেকচুয়াল ডেভেলপমেন্ট ইন ইউরোপ), বার্ট্রান্ড রাসেল (হিস্ট্রি অব ওয়েস্টার্ন ফিলোসফি) সহ অনেকেই। ইতালিতে আঠারো শতকে হাইপেশিয়া ‘আধুনিক সাহিত্য’-এর এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে উঠে আসে। দ্য স্যালুজো, কার্লো প্যাস্কাল, মারিও লুজি হাইপেশিয়াকে নিয়ে কবিতা, প্রবন্ধ আর নাটক রচনা করেন। জার্মান ভাষায় আর্নুলফ জিটল্ম্যানের ইতিহাস ভিত্তিক উপন্যাস

'হাইপেশিয়া' (১৯৮৯) দারুন জনপ্রিয়তা পায়। ক্যানাডাতেও প্রায় একই সময়ে আঁদ্রে ফেরেত্তি আর জ্য মার্সেল হাইপেশিয়াকে নিয়ে দু দুটি দীর্ঘ উপন্যাস রচনা করেন। নারীবাদীরা হাইপেশিয়াকে ঘিরে রচনা করতে শুরু করেন নারীবাদী সাহিত্য। নারীবাদী কবি এবং ঔপন্যাসিক উর্সুলা মোলিনারো হাইপেশিয়াকে নিয়ে আশির দশকের শেষভাগে রচনা করেন একটি গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ। আজ দু' দুটি বিখ্যাত গবেষনা-সাময়ীকীর (জার্নাল) নাম হাইপেশিয়ার নামানুসারে রাখা হয়েছে। একটি হল এথেন্স থেকে প্রকাশিত *'হাইপেশিয়া: ফেমিনিসট স্টাডিস'*; এবং অপরটি *'হাইপেশিয়া : এ জার্নাল অব ফেমিনিস্ট ফিলোসফি'*। হাইপেশিয়া উঠে এসেছে আজকের দিনের নারীবাদী চিত্রকর্ম এবং শিল্পকলাতেও - অত্যন্ত প্রবলভাবেই। ১৯৭৯ সালে হাইপেশিয়াকে নিয়ে নারীবাদী চিত্রকর জুডি শিকাগোর একটি স্থাপত্যকর্ম স্যান ফ্রান্সিস্কো মিউজিয়ামের 'আধুনিক চিত্রকলা'তে প্রদর্শিত হয় [১২]। সে তুলনায় বরং বাংলা সাহিত্য, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ এবং শিল্পকলায় হাইপেশিয়ার উল্লেখ নিতান্তই অপ্রতুল।

সভ্যতার উষালগ্ন থেকেই জ্ঞান-বিজ্ঞানে নারীরা অবদান রেখেছে বিপুল ভাবে। 'বিশ্বকবি' রবিঠাকুর সভ্যতার বিনির্মাণে নারীর কোন অবদান খুঁজে না পেলেও আধুনিক সমাজবিজ্ঞানী, প্রত্নতাত্ত্বিক, এবং নৃতত্ত্ববিদদের মতে মানব সভ্যতার শুরুর প্রথমদিকে নারী-পুরুষের অবদান ছিলো প্রায় সমান সমান। অনুমান করা হয় আগুনের আবিস্কারক ছিলো নারী [৪]। যদি তা নাও হয়, এটি নিঃসন্দেহ যে নারীরাই প্রথম আগুন ও তাপ দিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে খাদ্য-সংরক্ষণ করতে শিখেছে। নৃতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব এমনকি প্রাচীনকালের পুরাণতত্ত্বগুলোও সাক্ষ্য দেয় যে, নারীরা প্রথম থেকেই খাদ্যসংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং সংরক্ষণের ভূমিকায় নিয়োযিত ছিলো [১৮]। কাজেই যৌক্তিকভাবেই এটি ধরে নেয়া হয় যে নারীরাই সেই ব্যবস্থাগুলোর উন্নতি সাধন করেছে। গবেষকরা এও স্বীকার করেন যে নারীরাই তৈরী করেছে হোর্টিকালচার বা উদ্যানবৃত্তির [১৯]। মানব সভ্যতার উষালগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত লক্ষাধিক বছর পার হয়ে গেছে, অথচ পুরো সময়কালের শতকরা নিরানব্বই ভাগ সময়ই মানুষ কাটিয়েছে সেই প্রাক-উদ্যানবৃত্তির সময়টিতে যখন পুরুষেরা শিকার এবং মৎসাহরণের সাথে যুক্ত ছিলো, আর মেয়েরা যুক্ত ছিলো গৃহস্থালীর নানা রকমের কাজ আর ফলমূল ও অন্যান্য খাবার-দাবার সংগ্রহ আর সংরক্ষণে। গবেষকরা বলছেন যে, সে সময় শিকারের মাধ্যমে পুরুষেরা যে পরিমাণ খাদ্য সংগ্রহ করতো, তাতে মাত্র ২০ থেকে ৪০ ভাগ প্রয়োজন মিট্‌তো, বাকী ৬০ থেকে ৮০ ভাগ প্রয়োজনই মেটাতো আসলে নারীরা [১৮]। অর্থাৎ নারীরাই ছিল মুলতঃ খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থার উদ্ভাবক এবং নিয়ন্ত্রক। প্রাচীন পুরাণ এবং মিথ্‌গুলোও এই মতকে সমর্থন করে। দেখা যায়, রুটি-রুজির সংস্থানকারী হিসেবে যাদের উপাস্য হিসেবে ভাবা হত তারা সবাই ছিলেন দেবী- অর্থাৎ নারী - আইসিস, সাইবেল, অ্যাগদিস্তিস, দিনদিমিন, ইশতার, আসতারতে, রিঅ্যা কিংবা লক্ষ্মী। প্রায় সব জাতির মধ্যেই যে আদিম রূপকথা প্রচলিত আছে তাতে দেখা যায় স্বর্গের কোন দেবী তার আদ্যাশক্তি বিতরণ করেছিলো এই মর্তের মানুষের মাঝে যার ফলে মানুষ শিখেছিল বীজ বুনতে, উদ্যান তৈরীতে আর কৃষিকাজের জন্য উপকরণ বানাতে। প্রকৃতিজগতেও 'বৈজ্ঞানিক নারীবাদের' সমর্থন রয়েছে। যে শিম্পাঞ্জিকূলের সাথে আমরা -গর্বিত মানুষরা- শতকরা প্রায় ৯৯ ভাগ সদৃশ জীন বিনিময় করি, তাদের সাথে তুলনা করেও দেখেছি যে, পুরুষ শিম্পাঞ্জীদের তুলনায় স্ত্রী-শিম্পাঞ্জীরা অনেক বেশী সময় ব্যয় করে ছোট ছোট হাতিয়ার আর যন্ত্রপাতি তৈরীর কাজে। সেগুলো তারা ব্যবহার করে মাটি খোঁড়া আর খাবার সংগ্রহে [৭]।

সম্ভবতঃ মেসোপটেমিয়ার মুরিবেতের মেয়েরাই সর্বপ্রথম ভূমি-কর্ষণ করে বীজ বুনতে শিখেছিলো খ্রীস্টের জন্মের ৮০০০ বছর আগে [১৮]। সে সময় প্যালেস্টাইনে মেয়েরা শিখেছিলো শস্যক্ষেত্র আর সবজি বাগানের পরিচর্যা করতে, আর তুরস্কে গম থেকে রুটি বানাতে। পরবর্তীকালে মৃৎপাত্র তৈরীর রাসায়নিক প্রক্রিয়া, সুতা কাটার বিদ্যা, তাঁতের প্রযুক্তি আর শণ ও তুলার রকমারি উদ্ভিদবিদ্যা শেখানোর কৃতিত্ব

শুধুমাত্র নারীদের। নারীরাই প্রথম চিকিৎসক, শিল্পী আর প্রকৌশলী [৪]। কাজেই এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে নারীদের কর্মস্থল শুধু রন্ধনশালা আর শয়নকক্ষেই সীমাবদ্ধ ছিলো না, নারীরা পুরুষদের সাথে পাল্লা দিয়ে উন্নয়ন ঘটিয়েছিলো সে সময়ের জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রযুক্তির।

আজ তবে নারী বিজ্ঞানী, গবেষক, গণিতবিদ আর প্রযুক্তিবিদদের এত অপ্রতুলতা কেন পুরুষদের তুলনায়? এ প্রশ্ন উঠতেই পারে। পুরুষের পাশাপাশি একদিন যে নারী পত্তন করেছিলো, বিস্তার ঘটিয়েছিলো প্রযুক্তি-নির্ভর সভ্যতার, আজ সে নারীর অধিকাংশই প্রযুক্তি আর সভ্যতা থেকে যোজন মাইল দূরে; পর্দা, প্রথা, বিশ্বাস-অপবিশ্বাস আর হাজারো পুরুষতান্ত্রিক নিয়মের ঘোরটপে বন্দি। এ তো নারী জাতির এক পরাজয়ই বটে। কখন তাহলে ঘটেছিলো নারী জাতির এই 'ঐতিহাসিক পরাজয়'? অনেক গবেষকই আজ দায়ী করেন কৃষিব্যবস্থাকে [২০]। তারা মনে করেন হোর্টিকালচার থেকে কৃষিব্যবস্থার উত্তোরণে সভ্যতা এগিয়েছে অনেক, কিন্তু কেড়ে নিয়েছে দু'দুটি প্রগতিশীল মানবিক সত্ত্বাকে। কৃষিকাজের উদ্ভবের পর থেকেই নারীরা বন্দি হয়েছে গৃহে; মূলতঃ নিয়োযিত হয়েছে গৃহস্থালির পরিচর্যায় আর সন্তান লালন-পালনে, আর কৃষিব্যবস্থার ফলেই নিখুঁতভাবে তৈরী হয়েছে শ্রমবিভাজনের, পরবর্তীতে ব্যক্তিগত মালিকানার। আর এ ব্যবস্থার ক্রমোত্তরনেই নারী ক্রমশঃ বিচ্ছিন্ন হয় খাদ্যোৎপাদনের তথা প্রযুক্তির মূলস্রোতধারা থেকে। এঙ্গেলস তার 'পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্টরের উৎপত্তি' (১৮৮৪) নামের কালোত্তীর্ণ বইটিতে দেখিয়েছেন ব্যক্তিগত মালিকানার উদ্ভবের সাথে সাথে একসময় সম্পদ বাড়তে থাকে, আর সেই সম্পদই শেষ পর্যন্ত শত্রু হয়ে দেখা দেয় নারীর। অরণ্যপর্ব থেকে মানুষ যখন পৌঁছোয় কৃষিপর্বে, তখন সম্পদশালী হয়ে ওঠে বিভিন্ন গোত্র। একসময় ওই সম্পদ অধিকারে চলে আসে গোত্রপতিদের; তারা হয়ে ওঠে সম্পদশালী, উদ্ভাবন ঘটে ব্যক্তিগত মালিকানার। সম্পদ যত বাড়তে থাকে পরিবারে নারীদের থেকে গুরুত্ব বাড়তে থাকে পুরুষদের, পুরুষ মাতৃধারার প্রথা ভেঙে সৃষ্টি করে পিতৃতন্ত্রের প্রথা, নারী পরিনত হয় পুরুষের সম্পত্তিতে।

ইতিহাসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখা গিয়েছে বিজ্ঞান, গণিতশাস্ত্র, আর চিকিৎসাবিজ্ঞানে নারীরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে। কিন্তু ইতিহাসবেত্তারাই মানব সভ্যতার ইতিহাস লিখতে গিয়ে তা বারবার এড়িয়ে গিয়েছেন। অটোমান স্ট্যানলি তার 'মাদারস এন্ড ডটারস অব ইনভেন্সান' বইটিতে হাজারো দৃষ্টান্ত হাজির করে দেখিয়েছেন যে, পুরুষেরা যখন কোন প্রযুক্তির উদ্ভাবন ঘটিয়েছে তখন তা পুংখানুপুংখভাবে লিপিবদ্ধ করে রেখেছে, কিন্তু নারীরা যখন কোন প্রযুক্তির উদ্ভাবন ঘটিয়েছে তখন তা চলে গেছে বিস্মৃতির অন্তরালে। ইতিহাসবিদরা ঢালাওভাবে বলেছেন 'কে, কখন, কিভাবে এ প্রযুক্তি আবিস্কার করেছেন তা সঠিকভাবে বলা যায় না।' বহু ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে, মেয়েরা যে সমস্ত কাজকর্মে নিয়োজিত ছিল সেগুলোর ক্ষেত্রেই অমন ঢালাও 'স্টেরিওটাইপিং' করা হয়েছে। স্পিনিং হুইল বা চরকা এমনি একটি উদাহরণ। সম্ভবত নারীরাই এটির উদ্ভাবন ঘটিয়েছিলো চীন দেশে, কিন্তু আজ তার কোন লিপিবদ্ধ ইতিহাস পাওয়া যায় না, অথচ সেই চরকা যখন তের শতকের পর পশ্চিমা বিশ্বে প্রবেশ করে 'পুরুষের হাতে' উন্নত আর বিবর্ধিত হয়, তা তখন থেকেই যেন তা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করার আগ্রহ শুরু হয়ে যায়।

তারপরও পুরুষতান্ত্রিক ইতিহাসের জাল ভেদ করে অনেক নারীই প্রতিটি যুগে আমাদের সামনে চলে এসেছেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন হাইপেশিয়া, মাদাম কুরী, লরা বেসি, সোফিয়া কোভালেভস্কায়া, লিস মিন্টার প্রমুখ। এ কজন ছাড়াও আরও আছেন ক্যারলিন হারসেল, মেরী অ্যানী ল্যাভরশিয়ে এবং ডি.এন.এ এর উদ্ভাবক রোজালিন ফ্র্যাঙ্কলিন। এদের সবাই গবেষণাগারে পুরুষ

সহযোগীদের সাথে একনিষ্ঠভাবে কাজ করেছেন; অথচ ওই সহযোগীরাই তাঁদের অবদানকে অনেক সময়ই অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিতে চেয়েছেন। ফ্র্যাঙ্কলিনের কথা তো বলাই যায় - ডি.এন.এর 'যুগল সর্পিলের' রহস্যভেদ করার পরও প্রাপ্য কৃতিত্ব থেকে তাঁকে ইচ্ছে করেই বঞ্চিত করা হয়েছে। জোসলিন বেল পালসার আবিস্কারের পরও নোবেল পুরস্কার পাননি, পেয়েছেন তাঁর পুরুষ সহযোগী অ্যান্থনী হিউয়িশ [২১]। আইনস্টাইন আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্ব নিয়ে লিখিত যুগান্তকারী পেপারটিতে তার স্ত্রী মিলেভা আইনস্টাইনের অনেক অবদান থাকা সত্ত্বেও তা এড়িয়ে গেছেন [২২]। ভেরা রুবিন 'ডার্ক ম্যাটার' বা গুপ্ত পদার্থ আবিস্কারের পরও স্বীকৃতি পেতে তাঁকে অপেক্ষা করতে হয়েছে দীর্ঘ সময়। উনিশ শতকে ব্রিটেন এবং আমেরিকায় এমন আইনও করা হয়েছিলো, বিবাহিত নারীরা যদি কোন 'পেটেন্ট' উদ্ভাবন করে থাকেন, তা স্বামীর সম্পত্তি হিসেবে বিবেচিত হবে [৭]। এ সব কিছুই পুরুষেরা ব্যবহার করেছে নারীর উদ্ভাবনী শক্তিকে অবদমিত আর ব্যহত করার কাজে। এটি নিঃসন্দেহ যে, নারীরা সভ্যতা-নির্মানের এক বড় অংশীদার হওয়া সত্ত্বেও পুরুষশাসিত সমাজের সীমাবদ্ধতায় পথ হারিয়েছে বারে বারে। কিন্তু যে নামটি সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব নিয়ে উঠে এসেছে, যার মৃত্যুর সাথে জড়িয়ে আছে আলেকজান্দ্রিয়া গ্রন্থাগারের ধ্বংস, আর মধ্যযুগীয় অন্ধকার যুগের সূচনা - তিনি হলেন হাইপেশিয়া। হাইপেশিয়া হত্যায় বিক্ষুব্ধ হয়ে চার্লস লিকন্ট দ্য লিসল এক সময় নিবেদন করেছিলেন আবেগময় পংক্তিমালা, আমার অক্ষম হাতের আনুবাদে তার অনেকটাই হয়ত নিরস শোনাবে :

> 'সে একা বেঁচে আছে, যেন শাশ্বত চিরন্তনী হয়ে
> মৃত্যু কেবল বিক্ষিপ্তই করতে পারে এই কম্পমান বিশ্বব্রহ্মান্ডকে
> কিন্তু আজো সৌন্দর্য তাঁর আগুন হয়ে জ্বলে
> আর তাঁর ভিতর পুনর্জন্ম ঘটে যেন সকলের
> এবং ধরিত্রী ভুলুন্ঠিত হয়ে পড়ে রয় তাঁর শুভ্র চরণ তলে।'

বার্ট্রান্ড রাসেল তার *হিস্ট্রি অব ওয়েস্টার্ন ফিলোসফি* গ্রন্থে স্পস্ট করেই বলেছেন, হাইপেশিয়াকে হত্যার মাধ্যমে আলেকজান্দ্রিয়ার খ্রীষ্টিয় মৌলবাদীরা নিশ্চিত করেছিল যেন আর কখনও কোন দার্শনিক ভবিষ্যতে তাদের এমনিভাবে না জ্বালায়। হাইপেশিয়ার বেদনাঘন উপাখ্যান মনে করিয়ে দেয় আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতির বিদুষী নারী 'খনা'কে যার খ্যাতি ক্ষুব্ধ করে তুলেছিলো তদানিন্তন পুরুষতন্ত্রকে। শেষপর্যন্ত খনার জীহ্বা কেটে ফেলে পুরুষতন্ত্র একসময় পালন করেছিলো তাদের জয়ন্তী উৎসব। ঠিক তেমনিভাবে হাইপেশিয়াকে হত্যার মাধ্যমে পুরুষতন্ত্রের পুরোধা খ্রীষ্টিয় চার্চ আকাশে উড়াতে চেয়েছিলো তাদের বিজয় কেতন, যা প্রকারান্তরে সূচনা করে মানব-ইতিহাসের এক কলঙ্কজনক ঘোর কৃষ্ণ অধ্যায়ের - অন্ধকার যুগ বা *ডার্ক এজ*-এর ।

এই 'পবিত্র' বড়দিনে হাইপেশিয়ার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাই।

ই-মেইলঃ charbak_bd@yahoo.com

তথ্যসুত্রঃ

১) *পশ্চিম যাত্রীর ডায়েরী* , রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী, দশম খন্ড, বিশ্বভারতী সুলভ সংস্করণ।

২) Women in Philosophical Dictionary, Voltaire, Vol. 10, Dumon Paris, 1764(1901)
৩) ব্রুনোর আত্মত্যাগ ও যুক্তিবাদ - শহিদুল ইসলাম, মুক্ত-মনা; জিওর্দানো ব্রুনো স্মরণে সেমিনার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুষ্টি ও খাদ্যবিজ্ঞান ইন্সটিটিউট মিলনায়তন, ২৯ এপ্রিল ২০০৫।
৪) *মহাজাগতিক আলোয় ফিরে দেখা*, আসিফ, সময় প্রকাশন, ২০০৩।
৫) *Women and Technology in Ancient Alexandria : Maria and Hypatia*, Margaret Alic, Women's Studies Int. Quart., Vol.4, No. 3, pp 305-312, 1981
৬) *Women, Technology and Innovation*, ed. Joan Rothschild, New York : Pergamon, 1982.
৬) *Diophantus of Alexandria: A study on the History of Greek Algebra*, Thomas L. Heath, Dover, New York, 1964
৭) *Mothers and Druthers of Invention: Notes for revised History of Technology*, Autumn Stanley, The Scarecrow Press, Inc. Metuchen, N.J., & London, 1993
৮) *Hypatia*, Joseph McCabe, Critic, Vol 43, pp 267-272.
৯) *Hypatia's Heritage*, Margaret Alic, Boston, 1986.
১০) *Humanisms and History of Mathematics*, A. W. Richeson, ed. G. W. Dunnington, National Mathematics Magazine, Vol. 15, 1940, pp 74-82.
১১) *Women of Mathematics*, R. Jacobacci, Arithmetic Teacher, Vol. 17.4, 1970, pp 316-324.
১২) *Hypatia of Alexandria*, Maria Dzielska, Translated by F. Lyra, Harvard University Press, England, 1995.
১৩) *Life of Hypatia*, Socrates Scholasticas, from his ecclesiastical History, Alexandra 2, Cosmology, Philosophy, Myths and culture, Ed. David Fideler, Phanes Press.
১৪) *Hypatia and or the New Foes with an Old face*, Charles Kingsley, Conkley, Chicago, 1853 (1906)
১৫) *The Murder of Hypatia*. Socrates Scholasticus. Fifth Century (1953). In: Freemantle, Ann ed. A Treasury of Early Christianity, pp. 379-380. Viking, New York.
১৬) *Women in Mathematics*. Lynn M. Osen. The MIT Press, Cambridge (1975).
১৭) *The Decline and Fall of Roman Empire, vol 1-3*, Edward Gibbon, Everyman's Library; Boxed ed (1993)
১৮) *Daughters of ISIS, Daughters of Demeter: When Women Sowed and Reaped,* Autumn Stanley, Women's Studies Int. Quart., Vol 4, No. 3, pp. 289-304 (1981).
১৯) *Female of the Species*, M. Kay Martin & Barbara Voorhies, New York: Columbia University Press, 1975.
২০) *The Worst Mistake in the History of the Human Race*, Jared Diamond, Discover Magazine, pp Pages 64-66, May 1987
২১) *আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী*, অভিজিৎ রায়, অঙ্কুর প্রকাশনী, ২০০৫।
২২) *আজি হতে শতবর্ষ আগে*, অভিজিৎ রায়, (মুক্তমনা) সাপ্তাহিক যায় যায় দিন, ১৫ মার্চ, ২০০৫